এক অ-ফ্যাসিবাদী জীবনের পথনির্দেশ

প্রকাশিত হতে চলেছে। বাংলায় অনুদিত, 'অ্যান্টি ওয়েদিপাউস' গ্রন্থের মিশেল ফুকোর ভূমিকা এবং জিল দেলেউজের 'নিয়ন্ত্রিত সমাজের উপসংহারের পরের কথা'।

সম্ভাব্য মূল্য দশ টাকা।

মন্থন সাময়িকী পত্রিকার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

Vol 5 Issue 6 16 September 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

পঞ্চম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সোমবার ২ টাকা

• সাইকেল প্রতিবাদ পৃ ২ • উত্তরবঙ্গে উত্তরাখণ্ড পৃ ২ • ডেঙ্গি পৃ ৩ • নাটকে বাউলসম্রাট পৃ ৩ • বেহাল রাস্তা পৃ ৩ • ওয়ারশ পৃ ৪ • তাসের দেশ পৃ ৪

গুজরাতবাসীদের জরুরি আবেদন

দেশ জুড়ে মিঠি ভিরদি পরমাণু শক্তি প্রকল্পের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন

ভাবনগর জেলা গ্রাম বাঁচাও সমিতি, গুজরাত অণু-উর্জা মুক্তি আন্দোলন ও পর্যাবরণ সুরক্ষা সমিতির চিঠি, ১৪ সেপ্টেম্বর •

গুজরাতের প্রস্তাবিত ৬০০০ মেগাওয়াট মিঠি ভিরদি পরমাণু শক্তি প্রকল্পের দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা আপনাদের সাহায্য চাইছে। আপনারা ২৩ সেপ্টেম্বর কিংবা তার আগে আপনাদের শহরে বা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সভার আয়োজন করুন। সেই সভায় এই প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনের সপক্ষে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করুন। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন কর্তৃপক্ষের এক বৈঠকে এই প্রকল্প চূড়ান্ত করা হবে। যদি আপনি আমেরিকায় থাকেন, তাহলে নিউ ইয়র্ক শহরে ওই সময়টাতেই একটা প্রতিবাদ সংগঠিত করুন।

গুজরাত সরকারের সঙ্গে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার এক চুক্তির মাধ্যমে গুজরাতের ভাবনগর জেলার মিঠি ভিরদি গ্রামকে পরমাণু প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। জাসপারা, মিঠি ভিরদি, মান্ডয়া, খাদারপার ও সোসিয়া — এই পাঁচটি গ্রামের ৭৭৭ হেক্টর উর্বর চাষের জমি এই প্রকল্পের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে। জাসপারা, মিঠি ভিরদি ও সোসিয়া উপকূলবর্তী গ্রাম। এই জমিতে বাদাম, গম, বাজরা, তুলো, নারকেল, চিকু এবং দারুণ সুস্বাদু আমের ফলন হয়। এই এলাকায় পেঁয়াজ, বেগুন, টমাটো, লাউয়ের মতো সবজি চাষ হয়। এছাড়া এখানকার মাটিতে কাজু বাদামও হয়। এইসব গ্রামের মানুষ জানত না যে তাদের খেতের ওপর পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প হতে চলেছে। পর্যাবরণ সুরক্ষা সমিতির কাছ থেকে সর্বনাশের খবর পেয়ে ২০০৭ সালে এইসব গ্রামের মানুষ ভাবনগর জেলা গ্রাম বাঁচাও সমিতি এবং অণু উর্জা অভ্যাস জুথ, গুজরাত অণু-উর্জা মুক্তি আন্দোলন ও পর্যাবরণ সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগে পরমাণু প্রকল্পের বিপদ সম্পর্কে অবহিত হয়। তখন থেকে তারা আওয়াজ তোলে, 'পরমাণু প্রকল্প মিঠি ভিরদি-তে নয়, পৃথিবীর কোথাও নয়'।

২০১১ সালে জাপানের ফুকুশিমার ভয়াবহ পরমাণু চুল্লির দুর্ঘটনার পরেও ভারত সরকার জিদ ধরে তামিনাডুর কুডানকুলাম, মহারাষ্ট্রের জইতাপুর, অন্ধ্রপ্রদেশের কোভাডা, হরিয়ানার গোরখপুর, মধ্যপ্রদেশের চুটকা এবং পশ্চিমবঙ্গের হরিপুরে পরমাণু প্রকল্প তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তারাপুর, রাওয়াতভাটা, কলপক্কম, কাইগা, কাকরাপার ও হায়দ্রাবাদে মানুষ তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়া ও তার বিষম প্রভাব নিয়ে প্রতিবাদ করেছে। ইউরেনিয়াম মাইনিং নিয়েও ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মেঘালয়ে প্রতিবাদ হয়েছে। সরকার ও পরমাণু কর্তৃপক্ষ কোনো কথায় কান দিচ্ছে না।

২০ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং আমেরিকা সফর করবেন। সম্ভবত ওই সময়েই পরমাণু বিদ্যুৎ কোম্পানি ওয়েস্টিংহাউস ও নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার মধ্যে মিঠি ভিরদি পরমাণু শক্তি প্রকল্পের চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে। এর প্রতিবাদে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ২৩ সেপ্টেম্বর মিঠি ভিরদি থেকে ভাবনগর ৪০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে যাবে। আপনারাও ওইদিন ওদের প্রতিবাদের পাশে দাঁড়ান। আপনার নিজের জায়গায় নিজের মতো করে সংহতি জ্ঞাপন করুন।

টীকাকরণ কতটা প্রয়োজন?

এই বিষয়ে বলবেন বিনিতা মনসাটা। আর্থকেয়ার বুকস, ১০ মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭১, ২৯ সেপ্টেম্বর, বিকেল পাঁচটায়। সঙ্গে থাকছে প্রশ্নোত্তর। আয়োজনে তাল লয় ছন্দ — একটি স্ব-নিরাময় কেন্দ্র। সকলে স্বাগত।

নব মহাকরণের দেশে পরিবর্তনের হাওয়া

কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল, মন্দিরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর • বিদ্যাসাগর সেতুর টোল ট্যাক্স পেরিয়ে উড়ালপুলের একটা রাস্তা নেমেছে শিবপুর মন্দিরতলায়। মন্দিরতলা জমজমাট জায়গা। খাবারের দোকান, মিষ্টির দোকান, ওষুধের দোকান, বাসস্টপ। সব মিলিয়ে একটা জংশন পয়েন্ট। বাস থেকে নেমে বাঁদিকে ঢুকতেই, ঠাকুরদালান সংলগ্ন মাঠ, যেখানে দুর্গাপুজো হয় খুব জাঁক করে। একটু এগোলেই বাঁদিকে উড়ালপুলের নিচে সাইকেল স্ট্যান্ড, মোটরবাইক স্ট্যান্ড চোখে পড়ে। মানুষজন এখানে বাস থেকে নেমে সাইকেল বা মোটরবাইক নিয়ে কদমতলা রামকৃষ্ণপুর এসব জায়গায় নিজ বাসস্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

আসলে এই গৌরচন্দ্রিকাটুকুর প্রয়োজন এ কারণেই, আমরা যদি উড়ালপুলের নিচের রাস্তাটা ধরে কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরে ব্যাতাইতলার দিকে এগোই, সামনেই পড়বে নব মহাকরণ। ১৪তলা বিশাল সাদা বাড়ি (নাঃ, ভুল বললাম, এখন নীল সাদা)। কেউ বলে ষোলো তলা, ভূমিতলের নিচে নাকি আরও দু-তলা আছে। হওয়ার কথা ছিল গার্মেন্ট পার্ক, হয়ে গেল নতুন রাইটার্স বিল্ডিং। সাইকেল স্ট্যান্ড মোটরবাইক স্ট্যান্ড এখনও আছে। যেসব দোকানপাট ছিল (চা, খাবারদাবার), তার অনেকগুলোরই ঝাঁপ পড়ে গেছে। আরও এগোই, নব মহাকরণ যত কাছে আসে, চোখ পড়ে উড়াল পুলের নিচে একসময় গড়ে ওঠা নবপল্লি (নবপল্লি নামটা ভুল বললাম কি?)-র দিকে। গতকাল যা নতুন, আজ তা পুরোনো, আবার আজ যা নতুন, আগামীকাল তা পুরোনো। ইতিমধ্যেই দরমা ঘেরা টালির ঘর ভেঙেচুরে তছনছ।

কাঠের চৌকির একধারে ঝুলে থাকা মশারির সঙ্গে লেপটে থাকা লোলচর্মা এক বৃদ্ধা। কমলা ঘোরুই। বয়স কত হল ঠাকুমা? একশো পঁচিশ একশো তিরিশ হবে। পাশে বসে থাকা এক মহিলা বলেন, একশোর ওপরে বয়স। এখানে কবে এসেছিলেন? এই তো বাবা, ব্রিজ হওয়া থেকে আছি। ষষ্ঠীতলায় কুঁড়ে করে ছিলাম। যখন পাড়ার ক্লাবঘর হল, এখানে উঠে আসতে হল। থাকতে দিলে না। আর কোথায় যাব? এখানে থেকেই চলে যেতে চাই। এক যুবক বৃদ্ধ মণ্ডল, রিক্সা চালান। আগে কোথায় ছিলেন? ব্রিজ হওয়ার আগে মাকে নিয়ে এক বাড়িতে ছিলাম। মা তাদের বাড়ির কাজকর্ম করত। ব্রিজ হলে যখন সবাইকে কোয়ার্টার দিল ডুমুরজলায়, আমাদের উঠে আসতে হল এখানে ব্রিজের তলায়। কাগজপত্র তো কিছু ছিল না, ভাড়াটেও নই, তাই ...। কথা হল, সাধনা পণ্ডিতের সঙ্গে। লোকের বাড়ি কাজ করেন। স্বামী নেই, দুটি ছোটো ছেলে। বললেন, দেখি দূরে কোথায় ঠাঁই পাই। এদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান মৌসুমি মণ্ডল। শরীরে আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনা। বললেন, আমার এই অবস্থায় যাই কোথায় বলুন তো। আমার স্বামী শুধু ঘরামির কাজ করে। বৃদ্ধ মণ্ডল বলেন, এখানে আমরা পঞ্চাশ ষাট জন ছিলাম। আর সব মিলিয়ে ব্রিজের এদিকটাতে তা শ-দেড়েক তো হবেই। বেশি তো কম না।

চলে আসতে যাব, হঠাৎ চোখ পড়ে, কমলা ঠাকুমার ঠিক উল্টোদিকে চৌকির ওপর আধশোয়া অবস্থায় আরেক ঠাকুমার দিকে। পাশে বসে থাকা একটা বাচ্চা আগলাচ্ছেন। নাম জিজ্ঞাসা করতে বলেন, বিমলা কুর্মী। উল্টোদিকে কমলা ঠাকুমাকে দেখিয়ে বলেন, ওইটা আমার দিদি। আমরা দুই বোন এখানে এসে এইদিকে সংসার পেতেছিলাম। এখানে থেকেই ছেলেমেয়েদের বড়ো করেছি। ঘর ছিল শ্যামপুর, বাঁধের ধারে (রূপনারায়ণ নদী সম্ভবত)। নদীর পাড় ভাঙতেই এদিকে এসে প্রথমে ষষ্ঠীতলায় কুঁড়ে করে ছিলাম। তারপর থেকেই এখানে। তখনও ব্রিজ শুরু হয়নি। বনজঙ্গল সাফ করে দরমা দিয়ে ঘর করেছিলাম। আমি

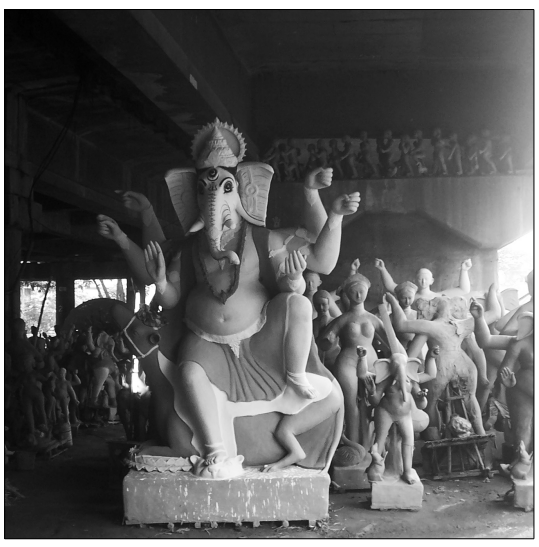

(ওপরে বাঁয়ে) অশীতিপর বৃদ্ধা কমলা ঘোরুই, উচ্ছেদ হয়ে ব্রিজের তলাতেই। (ওপরে ডানে) মন্দিরতলার নব মহাকরণ। (নিচে বাঁয়ে) ব্রিজের তলায় উচ্ছেদের মুখে দাঁড়িয়ে ঠাকুরগোলা। (নিচে ডানে) তৈরি হচ্ছে নব মহাকরণের পার্কিং লট। ছবিগুলি তুলেছেন শমীক সরকার। ৫ সেপ্টেম্বর।

কারোর সাহায্য ছাড়া লাঠি হাতে উঠে দাঁড়াতে পারি না বাবা। পড়ে গিয়ে কোমরের বল ভাঙল। যে বাড়িতে কাজ করতাম, সে বাড়ির এক মেয়ে ভালো চাকরি করে। সে-ই মেডিকেলে ভর্তি করে অপারেশন করে আনল। সত্তর হাজার টাকা লেগেছে। আমার কিছু ছিল, বাকিটা সে দিয়েছে। আমি এখান ছেড়ে বউমাদের কাছে যাব না। এখানে থাকি, এই যে বাড়িগুলোতে কাজ করতাম, তাদের কাছে কোনোভাবে যেতে পারলে কিছু দেয়। আমার খাওয়া জুটে যায়। এখানে থেকেই মরে গেলে বাঁচি। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। খারাপ লাগে দাঁড়িয়ে থাকতে। শমীককে বলি, চলো, অন্যদিকে যাই। সরে আসি। মনে পড়ে, কোনো পুরোনো দিনের বাংলা সিনেমার সংলাপ — 'ইট কাঠ পাথরের বাড়ি নয়, ঘর বানিয়েছিল মানুষ। হাজার হাজার বছর লেগেছিল মানুষের সেই ঘর বানাতে।'

এগিয়ে যাই নব মহাকরণের দিকে। বাঁদিকে চোখ পড়ে। গাড়ির গ্যারেজ গজিয়ে উঠেছিল। বেশিরভাগই নেই। ঘুরতেই, নব মহাকরণের উল্টোদিকে যে চা আর খাবারদাবার বিক্রির দোকান ছিল, সেই জায়গাগুলোও ফাঁকা। তার পেছনে জায়গা ঘিরে তৈরি হচ্ছে মহাকরণ সংলগ্ন পার্কিং লট। আরও এগোই। মাঝখানে আইল্যান্ডে বিদ্যাসাগর মূর্তি আর বাচ্চাদের খেলার পার্কটা আছে। কিন্তু উল্টোদিকে কর্নার করে থামের গায়ে একটি মেয়ের দোকান ছিল টুকিটাকি জিনিসের। সেখানে এখন শুধুই দেওয়াল।

টোল ট্যাক্স থেকে ওয়াই শেপ-এর যে রাস্তাটা নামছে, তার ডানদিকে পুলিশ ফাঁড়ির গায়ে নতুন রঙ পড়েছে। যে পুরোনো বাড়ির কঙ্কালগুলো পড়েছিল, সেগুলো হাওয়া। এপাশের বড়ো বড়ো গাছগুলো মুচরিয়ে কাটা হয়ে গেছে। বাঁপাশে ছিল গরুর খাটাল। এখন তা শূন্য দুয়ার। সামান্য কিছু শাকসবজি চাষ করত কোনো মানুষ। তা আর নেই। সে জায়গায় দু-পাশে জলভরা পরিখা। সিইএসসি-র কাজ হচ্ছে। ব্রিজের ধার ধরে ধরে এগোই ব্যাতাইতলার দিকে। ব্রিজের তলায় যতদূর চোখ যায়, ফাঁকা জায়গা বেরিয়ে পড়েছে। বুলডোজার ক্রেন ডাম্পার মিক্সার — এইসব মেশিন এসেছে। লাল সুরকি পড়ছে। রাস্তা হবে। হবে বাসস্ট্যান্ড। দক্ষিণপাড়ায় দুর্গা মণ্ডপের উল্টোদিকে যে ফুলের বাগান হয়েছিল টব সাজিয়ে, তা আর নেই। মুখ্যমন্ত্রীর ছবিটাও একদিকে হেলে কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে। এখানেও গাড়ি থাকত অনেক, আর ছিল স্ব-উদ্যোগে গড়ে ওঠা কুমোরটুলি। প্রচুর ঠাকুর তৈরি হত। বাঁ হাতে বড়ো মদের দোকান কাম বার। তার উল্টোদিকে, অল্প কিছু ঠাকুর প্লাস্টিক চাপা দেওয়া। কুমোরটুলি এখন সরতে সরতে ব্যাতাইতলা মনসাতলার কাছে এসে গেছে। প্রচুর ঠাকুর জড়ো করা দেখতে পাই।

মনসাতলার উল্টোদিকে ব্রিজের তলায় ঢুকে পড়ি। একজন মাঝবয়সী মানুষ, মাথায় টাক, এককোণে একতাল মাটি দিয়ে মা দুর্গার অসুরের গায়ে লাগাচ্ছেন। নাম কার্তিক চন্দ্র দে। জিজ্ঞাসা করি, কবে থেকে এখানে? বলেন, ব্রিজ শুরুর পর থেকে এখানে ঠাকুর গড়ছি। ঠাকুর গড়া জাতিগত পেশা নয়। বাবা চাকরি করতেন রেলে। পাঁচ ভাই। একটা কিছু তো করতে হবে। এই কাজ শিখতে শুরু করলাম। বড়ো হতে অনেক জায়গায় গেছি। শিলং-এ ছিলাম অনেক বছর। মালিক এখানে ফিরিয়ে আনল। কালিবাবুর বাজারে ছিলাম। তারপর এখানে। এই ঠাকুর গড়েই তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছি ভালো ঘরে। এই কাজে তিনশো টাকা রোজ। অন্য কোন কাজে হবে বলুন?

এসে দাঁড়িয়ে মিঠুন মণ্ডল। ও শিল্পী নয়। তবে এখানেই ঠাকুর গড়ার ব্যবসা। বলে, এখানে অনেক সুবিধা ছিল দাদা। পাড়াটাও ভালো। ব্রিজের তলায় কোনো ছাউনির দরকার হয় না। পুলিশের লোকজন এসেছিল। এখনও সরে যেতে বলেনি। পুজো পর্যন্ত তো আছি। তারপর কোথায় যাব, জানি না। নাগরিক অভ্যাস থেকে খোঁচাতে ছাড়ি না। বলি, মিঠুন, লোকে বলে এই সার সার ঠাকুরের আড়ালে অনেকে নেশাভাঙ করে। মদ গাঁজার ঠেক তৈরি হয়েছে। কথা শেষ করতে পারি না। মিঠুন বলে, সেসব কোথায় নেই দাদা? ওই যে ফ্ল্যাট বাড়িগুলো দেখছেন, ওখানকার লোকজন খায় না? বড়ো লোকেরা খেলে বলে, ড্রিঙ্ক করছে। গরিব হলে বলে, মাতাল। কত লোক আসে ঠাকুর নিতে বায়না করতে। তারা একপাশে সরে গিয়ে যদি খায়, তো আমি কি না করব? তাছাড়া এই লাইনে খাটুনিও খুব যায়। এত খাটে, তাদেরকে একটু আধটু খেতেও হয়। চোখ যায় পেটমোটা গণেশ মূর্তির দিকে। এত কালারফুল (গোলাপি গা, মাথায় গলায় সোনা রঙের মুকুট, গয়না), দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনসাতলার মুখেও দেখি এক বিশাল গণেশ মূর্তি রঙ হচ্ছে। এদিকে বিশ্বকর্মা দুর্গা সব ঠাকুর হচ্ছে।

ব্রিজের তলায় কাঠের গোলা হয়েছিল অনেকগুলো। এক সকালে মানি পিসি আমাদের বাড়ি এসে হাজির। তাঁর ছেলেদের কাঠের গোলা তুলে দিচ্ছে। তিনি জিনিসপত্র রাখতে এসেছেন। ব্যাতাইতলায় একটা বড়ো গোলা এখনও অক্ষত। দেখা হয় টুকাই ও ছোট্টুর সঙ্গে। ব্রিজ শুরু থেকেই ওদের গোলা আছে। না, এখনও উঠে যেতে বলেনি। কদিন আগে বাড়িতে পুরোনো ইট রেখে দিয়ে গেছে কিশোর। ভ্যানচালক। কিশোর ওর শক্তপোক্ত চেহারার মতোই ভ্যানটাকে শক্তপোক্ত করে রেখেছে। দেওঘরে বাড়ি। এখানে থাকত ব্রিজের তলায়। এখন পুজোর পরে কোথায় যায়। ওর কথায়, ঠাকুর যেদিকে নিয়ে যাবে। ওর মতো অনেক খেটে খাওয়া মানুষ থাকত ব্রিজের তলায়। পুলিশ নাকি কয়েকজনকে আটশো চল্লিশ টাকা করে ফাইন করেছে। তারা পালিয়েছে দেশে। অন্যরা চেয়ে আছে, ঠাকুর যেদিকে নিয়ে যাবে।

সম্পাদকের কথা

জয়ন্তী পাহাড়ে ডিনামাইট ব্লাস্টিং হলে কোচবিহার শহরটা কেঁপে ওঠে

সম্প্রতি দিনহাটা ও কোচবিহারে কয়েকটি সভায় উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে বন্যা ও ধস নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। একটি আলোচনায় শ্রোতারা আলোচকের সঙ্গে নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলিকে বিনিময় করেন। উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে বড়ো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ডিনামাইট ব্লাস্টিং করে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে, নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আজ যখন বিপর্যয় এল, তখন প্রকৃতি যেন সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল! নদী আবার তার স্বাভাবিক প্রবাহে ফিরে এল। মন্দাকিনী নদীর ক্ষেত্রে কেদারঘাটিতে এটাই ঘটেছে। এই বিবরণ শুনতে শুনতে একজন মহিলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'জয়ন্তী পাহাড়ে ডিনামাইট ব্লাস্টিং হলে কোচবিহার শহরটা কেঁপে ওঠে'।

জয়ন্তী পাহাড় কোচবিহার শহর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটারের বেশি দূরে। ভাবতেও শিউরে উঠি। ওই মন্তব্য শুনে আর একজন শ্রোতা স্বগতোক্তি করেন, 'আসলে আমরা তেমন গা করি না। একটা বড়ো ট্রাক রাস্তার ওপর দিয়ে গেলেও তো চারপাশ কাঁপে। কখন কী জন্য কম্পন হয়, কে অত খবর রাখে!' কিন্তু এই প্রত্যেকটা কাঁপন অগোচরে আমাদের ভিটে-মাটি, পথঘাট সবকিছুকেই নড়বড়ে করে দেয়। উত্তরাখণ্ডের মেখণ্ডা গ্রামের ঘরে ঘরে দেওয়ালে ফাটল ধরে। তবু মানুষ সাবধান হয় না। আরও বড়ো বিপর্যয়ের জন্য সে যেন অপেক্ষা করে বসে থাকে।

আলোচনায় মগ্ন হয়ে প্রত্যেকের মনে নানান প্রশ্ন জেগে ওঠে। তাদের সামনে ভেসে ওঠে উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীর ছবি। সেই নদীর বুকে বাঁধ আর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের তাণ্ডবের ছবি! একদিকে আসন্ন বিপন্নতার ছবি, অন্যদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (বা এনার্জি) নির্ভর আধুনিক জীবনের হাতছানি। কোনটাকে সে উপেক্ষা করে? সভায় কলেজের ছাত্র যারা এসেছিল, তারা তো সেই আধুনিক জীবনের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেওয়ার জন্যই লড়াইয়ে তৈরি হচ্ছে! সে তো ছোটোবেলা থেকে শিখে এসেছে, 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে'। ফলে পাহাড়, জলবিদ্যুৎ থেকে সরে আলোচনাটা চলে যায় বিদ্যুতের প্রয়োজন কতখানি সেই প্রশ্নে। এসে যায় মানুষের প্রয়োজন ও অপচয়ের প্রশ্ন; প্রয়োজন ও লোভের প্রশ্ন।

জয়ন্তী পাহাড়ে ডিনামাইট ব্লাস্টিং হলে কোচবিহার শহরটা কেঁপে ওঠে। সেই কম্পনের অনুরণন যেন সভার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। সকলেই যেন বুঝতে পারি, পায়ের নিচে শক্ত মাটিটা কত প্রয়োজনীয়।

এবার কলকাতায় সাইকেল নিষেধের প্রতিবাদ কুলীন সমাজের মধ্যে থেকেও

শমীক সরকার ও অলোক দত্ত, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর •

সাইকেল ধীরে চলে, এই অজুহাতে কলকাতার আটত্রিশটা রাস্তায় সাইকেল চালানো, এমনকী দাঁড় করিয়ে রাখা আইনত নিষিদ্ধ হয়েছে (সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা) ২০০৮ সালের আগস্ট মাস থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় যারা সাইকেল চালায়, তাদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেছে। ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজারের সাইকেলজীবীদের সংগঠনের তরফে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ, বালিগঞ্জ থেকে সাইকেল মিছিল (যা পুলিশ আটকে দেয় গড়িয়াহাটে), হাজরায় পথসভা সংগঠিত করা হয়েছে। সাইকেল সমাজ নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে কলকাতায় ছ-টি জায়গায় গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ, পরিবেশ দিবসে সারাদিন অবস্থান, পোস্টার নিয়ে সাইকেল যাত্রা এবং প্রচারপত্র ও পুস্তিকা বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংবাদমন্থন পত্রিকায় ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই ধারাবাহিকভাবে কলকাতায় সাইকেলচালকদের ওপর পুলিশি জুলুমের সংবাদ বেরিয়েছে। এই কাগজের এক প্রতিবেদক কলকাতা পুলিশের সাইকেল নিষেধাজ্ঞা বেআইনিভাবে বলবৎ করার সময় অকুস্থলেই তার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে গেলে দু-বার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেছে, গড়িয়াহাটে এবং শ্যামবাজারে। ঢাকুরিয়াতে লেক থানার সঙ্গে যোগসাজশে কলকাতা সাউথ ট্রাফিক গার্ডদের দ্বারা পথচারীর সাইকেল আটকে বেআইনিভাবে ১০০ টাকা জরিমানা নেওয়ার ঘটনা ক্যামেরাবন্দী করে পত্রিকায় ছাপিয়ে তা লালবাজার এবং লেক থানাকে দেওয়াও হয়েছে। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে সাইকেল ধরার সময় সরাসরি ট্রাফিক পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো ঘটনা ঘটেছে আকছার। বড়ো বড়ো মিডিয়ায় সাইকেল নিষেধের আইনের কথা খুব একটা আসেনি আগে। বরং আনন্দবাজার পত্রিকা কয়েকবছর আগে তার একটি সাপ্লিমেন্টারি পাতায় মুদিয়ালিতে সাইকেল নিষেধের আইন থাকা সত্ত্বেও কেন পুলিশ তা কঠোরভাবে পালন করছে না, সেই নিয়ে ছবি দিয়ে বিশাল এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। প্রতিবেদক ছিলেন দীক্ষা ভুঁইয়া।

অবশেষে সাধারণ মানুষের সাইকেল নিষেধের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এলিট সমাজের মধ্যেও, তার জেরে এমনকী আনন্দবাজারের মতো বড়ো মিডিয়াও সাইকেল নিষেধের বিরুদ্ধে উত্তর-সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছে। ঘটনার সূত্রপাত মাসখানেক আগে, ডাউন-টু-আর্থ নামে একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সাময়িকীতে সায়ন্তন বেরা-র একটি বড়ো এবং সুলিখিত প্রবন্ধের হাত ধরে। কয়েকদিনের মধ্যেই ওই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয় ইংরেজি দৈনিক দ্য স্টেটসম্যানের রবিবাসরীয় পাতায়। তার কয়েকদিনের মধ্যেই ওই প্রবন্ধের সূত্র ধরে (এবং ওই প্রবন্ধের কথা উল্লেখ না করে) গ্রীনপিসএক্স নামে একটি এনজিও সংগঠন ইন্টারনেটে কলকাতায় সাইকেল নিষেধের প্রতিবাদে ইন্টারনেটে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করে। উল্লেখ্য, কলকাতায় যারা সাইকেল চালায়, তাদের প্রায় সিংহভাগই শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ, ইন্টারনেটে তো দূরস্থান, তাদের কারোর কারোর মোবাইলও নেই। যাই হোক, এরপর রাইট টু ব্রিদ নামে একটি সংগঠনের কয়েকজন একটি সাইকেল র‍্যালি করে, যার খবর বেরোয় টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায়। তারপর গত ৮ সেপ্টেম্বর সকালে কলকাতায় চৌরঙ্গীর ভিক্টোরিয়া হাউস থেকে প্রেস ক্লাবের বাইরের অংশ পর্যন্ত শতাধিক সাইকেল ও মানুষ হেঁটে যায়। পরদিন বিভিন্ন বড়ো মিডিয়াতে এর রিপোর্ট বেরোয়।

৮ সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বানী ঘোষ, যিনি প্রাক্তন সাইক্লিস্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের বিভিন্ন সাইকেল সংগঠনের পদাধিকারী। এছাড়া ওইদিনের সভায় উপস্থিত ছিল রাইট-টু-ব্রিদ সংগঠনের মানুষরা। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের একটি সাইকেল দোকান ১৬-১৭টি সাইকেল ও কিছু লোক দিয়ে এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করে। ছিল দুটি সাইকেল কোম্পানির দেওয়া সাইকেলপ্রেমী গেঞ্জি। ছিল বেশ কিছু পোস্টার। তবে এই অনুষ্ঠানে কোনো স্লোগান বা বক্তব্য ছিল না। মিডিয়ার লোকেদের কাছে অবশ্য বক্তব্য রাখা হয় প্রেস ক্লাবের বাইরে। একবার কয়েকটি সাইকেল মাথার ওপরে তুলে ধরে হিপ হিপ হুররে ধ্বনি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, চৌরঙ্গী থেকে প্রেস ক্লাবের এই রাস্তাটি কঠোরভাবে সাইকেল নিষেধের আওতায়, এবং এই রাস্তাটায় সাইকেল চালিয়ে যাওয়া মানুষ খুব কম যাতায়াত করে। এই অনুষ্ঠানের পর এনএপিএম-এর পক্ষ থেকে মেধা পাটেকর সাইকেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দেন।

বছর দুই আগে যাদবপুর গড়িয়া থেকে শুরু করে মেটিয়াব্রুজ অবধি বিস্তীর্ণ এলাকা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আওতা থেকে কলকাতা পুলিশের আওতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বিভিন্ন রাস্তায় কলকাতা পুলিশের হোর্ডিং দেখা যাচ্ছিল, 'ধীর গতির যানবাহন নিষেধ'। এবছর জুন মাসে পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে সরাসরি সাইকেল নিষেধের হোর্ডিং ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যাদবপুর, গড়িয়া, আনোয়ার শাহ রোড প্রভৃতি এই সংযুক্ত অঞ্চলে। এই সব হোর্ডিং-এ অবশ্য কোন সময় থেকে কোন সময় সাইকেল নিষিদ্ধ, সেকথা বলা ছিল না। এই নতুন হোর্ডিং নিয়ে ডাউন-টু-আর্থের প্রতিবেদক সায়ন্তন বেরার প্রশ্নের উত্তরে লালবাজারের ট্রাফিক পুলিশের বড়োকর্তা জানান, এগুলো যদি অর্ডারে না থেকে থাকে, তাহলে শীঘ্রই নতুন অর্ডার বানিয়ে দেওয়া হবে। তারপর নতুন অর্ডারে অন্তর্ভুক্ত হবার পর দেখা যায়, ৩৮টি রাস্তা থেকে বেড়ে ১৭৪টি রাস্তায় সাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় পুরো কলকাতাতেই।

উল্লেখ্য, যে আইনবলে এই অর্ডারগুলি দিতে পারে কলকাতা পুলিশ, সেই ১৯৬৫ সালের ট্রাফিক আইনে বলা আছে, এইরকম অর্ডার বড়োজোর দু-মাসের জন্য দিতে পারে কলকাতা পুলিশ। তার বেশি সময় জুড়ে এইরকম অর্ডার রাখতে গেলে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের অনুমতি নিতে হবে।

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

প্রিয় সম্পাদক, কলকাতায় সাইকেল বেআইনি করার সংবাদে অবাক লাগছে। ঠিক যেমন কলকাতায় ট্রাম উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অবাক করেছিল। ট্রাম একটি দূষণহীন যান, যা এখন সর্বজন স্বীকৃত। ইউরোপের প্রায় সব বড়ো বড়ো শহরে ট্রাম চলে এবং সাইকেলের জন্য আলাদা ভাগ থাকে বড়ো রাস্তায়। আমস্টারডাম স্টেশন চত্বরে সম্ভবত পৃথিবীর সবচাইতে বড়ো সাইকেল স্ট্যান্ড রয়েছে। আমস্টারডামের জনবহুল রাস্তায়ও সাইক্লিস্টদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা দেখেছি। সেই রাস্তা বুঝি প্রায় আমাদের চিৎপুর রোডের মতো ঘিঞ্জি। নেদারল্যান্ডে প্রায় সব বাড়িতেই একটা সাইকেল আছে। গাড়ি থাকলেও লোকে সাইকেলই ব্যবহার করে বেশি। ওখানে গাড়ি চালাতে বেশ খরচ, কেননা রোড ট্যাক্স এবং ইনসিওর খরচ খুব বেশি। এমনকী পেট্রোলের দামও আমেরিকার চাইতে বেশি। সুইজারল্যান্ডেও আমি সাইকেলের আলাদা রাস্তা দেখেছি। প্যারিস এবং জার্মানির অনেক শহরেই লোকে সাইকেল ব্যবহার করে। প্যারিসের লুভ্র মিউজিয়ামের চত্বরে সাইকেলে পুলিশ ঘুরে বেড়ায় দেখেছি। সারা ইউরোপে, সাইকেল একটা বহুল ব্যবহৃত যান। পরিবেশ দূষণ রোধ এবং জ্বালানির সাশ্রয়ের জন্য গাড়ি থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ সাইকেল ব্যবহার করে এবং সরকার এতে উৎসাহ দেয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাইকেলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে মেইন রোডে। ইউরোপে ট্রাম প্রায় সব বড়ো রাস্তায় চলে। আমাদের সরকারের মাথারা কি পৃথিবী কোন দিকে চলছে তার কোনো খবর রাখেন না? কলকাতায় তো ফুটপাথগুলি পর্যন্ত এমন দশায় যে হাঁটা যায় না, প্রধান রাস্তায় নেমে পড়তে হয়। এমনকী পুরসভাও বেদখল করেছে ফুটপাথ, বাসস্ট্যান্ড বানিয়েছে ফুটপাথে। এরা কি কোনো খবরই রাখে না?

পরমেশ আচার্য্য, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর

পরের সংখ্যা থেকে সংবাদমন্থনে প্রকাশিত যে কোনো সংবাদ ও সম্পাদকীয় সম্পর্কে পাঠকের প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি নিয়মিত কলাম প্রকাশিত হবে। প্রতিক্রিয়া জানান নিচের ঠিকানায় :

বঙ্কিম
কল্যাণগড়, অশোকনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা।
ফোন : ০৩২১৬-২৩৮৭৪২,
ইমেল : manthansamayiki@gmail.com

চলতে চলতে

ভিড়ে ঠাসা বাস, জ্যামে ঠাসা রাস্তা

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর •

ভাদ্রের পচা গরম। বাসের ভিতরে সবার গলদঘর্ম অবস্থা। ভিড় ঠাসা বাস। আর বাসে-গাড়িতে সবকটা রাস্তা ঠাসা। বাস যতক্ষণ চলছে তার দ্বিগুণ সময় থেমে থাকছে। চলছেও ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে — কলকাতার সবকটা রাস্তা জ্যাম। পুজোর বাজার করে হাঁসফাঁস করতে করতে দুই হাতে কাঁড়িকাঁড়ি ব্যাগ নিয়ে উঠেছে একদল মহিলা। গড়িয়াহাট মোড় থেকে। তাদের কলর বলর পিছনের সিট থেকে কম শোনা যাচ্ছে। কারণ পিছনের সিটের ওপরে বাসের মাইকে এফএম রেডিওতে জোর গান চালিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার। গান হচ্ছে, 'আজকে তোমার জন্মদিনে কী দিই উপহার / বাংলায় নাও ভালোবাসা হিন্দিতে নাও পেয়ার।' — এরকম আরও কীসব হাবিজাবি পদের গান, তার সঙ্গে জগঝম্প বাজনা, কানে তালা লেগে যাচ্ছে। কেউ কিছু বলছে না। ওরকম ভয়ানক ভিড়ে গানটাকে অত্যাচার মনে হচ্ছে আমার। ওমা! ওপাশে সামনের সিটে জানলার ধারে বসা প্রবীণ ভদ্রলোক বাসের গায়ে হাত দিয়ে গানের তালে তাল ঠুকছেন।

পাশে বসা যুবকের হাতে বিরাট সাইজের মোবাইলে বারবার খবর আসছে — সম্ভবত তার বান্ধবী — একটা রিনরিনে মেয়ের গলা; যুবকটি বারবার প্রবোধ দিচ্ছে — এই তো আর একটুখানি, এই তো তিনটে স্টপ, কী করব জ্যামে পড়ে গেছি, আর একটু দাঁড়াও, এসে যাচ্ছি, এক্ষুনি এসে যাচ্ছি। পিছনের মোবাইলে বয়স্ক লোকের নাটকীয় চিৎকার — আমি বলছি মামনির ফোনে স্বপন হাত দেয় না তো, বলছি স্বপন ওর ফোনে হাত দেয় না তো, তুমি ছাড়ো, আমি দেখছি। তারপর একটু নীরবতার পর সেই ভদ্রলোকের গলা শুনে বোঝা গেল তিনি তাঁর মামনিকে ফোন করেছেন — কী ব্যাপার বলতো? কাল সারাদিন তোকে ফোন করলাম, একবারও ধরলি না, অথবা এনগেজড্, সারাদিনে একটা ফোন করতে পারলি না, কী ব্যাপার বলতো, তোরা কি আমায় মেরে ফেলবি? এই পর্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলে ভদ্রলোক হঠাৎ সতর্ক হয়ে চাপা গলায় বললেন, ঠিক আছে বুঝেছি বুঝেছি, বলতো, নাম্বারটা বলতো, হ্যাঁ, নাইন এইট ....

কে জানে মামনির কী হয়েছে। তার কথা ভাবার অবকাশ কই? সামনের সিটে বসা লোকটা খালি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বারবার পান পরাগের পিক ফেলছে। বাস থামলেই ফেলছে, তবুও আমায় সবসময় নজর রাখতে হচ্ছে — যদি গায়ে এসে লাগে। একবার বারণ করেছি — শুনছে না। এদিকে এক আধুনিক দম্পতি তাদের বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ভিড় ঠেলে বাসের পিছনের দিকে চলে এসেছে। তাদের ট্যাক্সি না পাওয়ার সশব্দ আপশোশের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ভিড় বাসে ওঠার কষ্ট ও বসার জায়গা না পাওয়ার বিরক্তি। একদম পিছনের টানা সিটের একজন যাত্রী ওদের জায়গা দেওয়ায় মা ছেলেকে কোলে নিয়ে বসল। জিনস্-টপ পড়া মা, ছেলের হাতের লম্বা বেলুন সামলাচ্ছে, ছেলেকে বলছে, ঠিক করে ধরো, লোকের গায়ে না লাগে। ছেলে বলছে বাস কেন চলছে না। মা বলছে, সামনে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে না — বাস, কার; তারপর ছেলেকে ভোলাচ্ছে, তোমার আজ কত জিনিস হল — বেলুন, ঘড়ি — হ্যান্ডওয়াচ। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাবা সংশোধন করে দিল — হ্যান্ডওয়াচ না রিস্টওয়াচ। তারপর সে মোবাইলে ফোন করে বলতে শুরু করল, হ্যালো, খাল ধারে ঝুনুদার ফ্ল্যাট থেকে বলছি, সোমদেব রায়, হ্যাঁ একটা ম্যাকডোয়েল, একটা প্লেন, ঘন্টা খানেক বাদে দিলেই হবে।

এই শুয়ার কা বাচ্চা, একদম ঢুকিয়ে দেব, যেখানে বলবি সেখানে ঢুকিয়ে দেবো — পাশের গাড়ির ড্রাইভার আমাদের গাড়ির ড্রাইভারকে খিস্তি করছে — আমাদের গাড়িটা ওকে ওভারটেক করে একটু তেরছা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ড্রাইভারও চেঁচাচ্ছে —যা বে যা, তোকে ভয় পাচ্ছি না। ট্রাফিক সিগন্যাল উঠে যেতেই আমাদের বাসটা বেশ জোর চালিয়ে চলে এল। এই শেষ মুহূর্তে এসে রাস্তা একটু ফাঁকা হয়েছে। বাস থেকে নেমে নতুন পাড়ায় ঢুকে দেখলাম দু-জায়গায় ঘটা করে গণেশ পুজো হচ্ছে। তারস্বরে মাইক বাজছে। অবাক লাগছে না। যাদের পয়সা আছে বা পয়সা তোলার ক্ষমতা আছে তারা এমন অনেক পুজোর জাঁক করবে। আর যাদের তা নেই তাদের একটা অংশ পুজোর প্রসাদের ভাগও পাবে। এই তো সামনের মোড়ে বাঁক নিয়ে রুটির দোকানের বৌদির কাছে দশটা রুটি অর্ডার দিয়ে বসে আছি। দেখলাম কলোনির থেকে তিনটে বাচ্চা ছেলে একটা সাইকেলে চেপে এসে মোড়ের মাথায় বসে থাকা রুটির দোকানের দাদাকে জিজ্ঞেস করছে, গণেশ পুজো কোথায় হচ্ছে? দাদা হেসে বললেন, প্রসাদ খাবি, যা, ওই তো বাঁদিকে আরেকটু এগিয়ে। ছেলেগুলো খুশি হয়ে চলে গেল। বৌদি তখন রুটি সেঁকতে সেঁকতে গজগজ করছে — এই লোকটাকে দেখলেই গা জ্বালা করে, একা হাতে আমি কত সামলাবো, খালি বেরিয়ে যায়, একটা কাজ করতে বললেই বলে শরীর খারাপ, কই বার বার বেরোতে তো শরীর খারাপ হয় না?

উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী শুনে স্কুল ছাত্রের প্রশ্ন, ওখানে কি সরকার গঠন হয়নি?

শ্রী রামকৃষ্ণ বয়েজ স্কুলে স্লাইড শো দেখছে ছাত্রছাত্রীরা। ছবি শ্রীমান চক্রবর্তীর তোলা।

রামজীবন ভৌমিক, কোচবিহার, ১৩ সেপ্টেম্বর •

গত ১২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ছ-টায়, খুদে পাক্ষিক পত্রিকা খবরের কাগজ সংবাদমন্থনের কোচবিহারের পাঠকবর্গ আয়োজিত উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয় ও আমরা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি হলে। ডিজিটাল স্লাইড প্রদর্শনী ও শমীক সরকারের বক্তৃতা দিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এরপর জিতেন নন্দী অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াঙ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা স্লাইড শোয়ের মাধ্যমে আমাদের সাথে ভাগ করে নেন। কোচবিহার মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের পক্ষ থেকেও উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয়ের পর ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণকারী সদস্যের বিভিন্ন মুহূর্তের চিত্র দেখানো হয়। ন্যাস গ্রুপের পক্ষে শ্রী অরূপ গুহ কোচবিহারের হাইরাইজগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, এই শহর ভূমিকম্পের চতুর্থ মাত্রার বিপদের এলাকার মধ্যে। কোচবিহারে দোতলার বেশি পাকা বাড়ি বানানো বোকামির কাজ হবে। বর্তমানে ছ-তলা সাত-তলা বাড়িগুলো আমাদের একদিন গভীর শোকাহত করবে।

এছাড়াও ১১ সেপ্টেম্বর বুধবার দিনহাটা ওকরাবাড়ি আলাবকস উচ্চবিদ্যালয়ে এবং ১২ সেপ্টেম্বর কোচবিহার শ্রী রামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলে বিকেল দুটোর সময় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উত্তরাখণ্ড বিপর্যয় সম্পর্কে আলোচনা ও স্লাইড শো প্রদর্শনী হয়। ছাত্রছাত্রীরা কৌতূহল সহ বোঝার চেষ্টা করে। ওকরাবাড়ি আলাবকস হাইস্কুলের একটি ছাত্র জানতে চান, উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি দুর্গম গ্রামগুলিতে মানুষের এত দিশেহারা অবস্থা কেন? ওখানে কি সরকার গঠন হয়নি?

উত্তরকাশীর ২৫ কিলোমিটার আগে নালুপানিতে বিপর্যয়ের দেড় মাস পরে রাস্তার ওপর ধসের চিত্র তিলক সোনির ক্যামেরায়, ২১ আগস্ট।

পর্ণশ্রীর বের করা জলে ডুবল মহেশতলা, বেহাল নিকাশি, রাস্তা অবরোধ

যতীন বাগচী, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর •

২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে বৃষ্টির পর কলকাতা পুরসভা ১৩১ নং ওয়ার্ড জলমুক্ত করে, সেই জল ফেলা হয় পার্শ্ববর্তী এলাকায় যা মহেশতলা পুরসভার ১২নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত। উল্লেখ্য, ওই ১৩১নং ওয়ার্ড কলকাতা পুরসভার মেয়রের নিজের এলাকা। মহেশতলা পুরসভার ওই অঞ্চলের সমস্ত রাস্তায় ও ঘরের মধ্যে জল ঢুকে যায় হঠাৎ, বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে এবং হকচকিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিভিতে মেয়রের ভাষণে কলকাতার জলমুক্ত হওয়ার কাহিনি শুনে বাসিন্দারা বুঝতে পারে, ব্যাপারটা এই। পর্ণশ্রী মেয়রের নিজের এলাকা — যা জলমুক্ত করার জন্য পাম্প করে সেই জল ফেলা হয়েছে মহেশতলায়। প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয় এবং শেষ পর্যন্ত পাম্প বন্ধ করতে বাধ্য হয় কলকাতা পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু মজার বিষয় — শুধু পর্ণশ্রীর ছাড়া জলে নয়, দু-বছর কোনো নিকাশি খাল পরিষ্কার না হওয়ার জন্য এতকাল জল জমেছে মহেশতলায়। ২৮ আগস্ট মাত্র চার ঘণ্টার বৃষ্টিতে আবার এলাকা জলে ডুবে যায়। এবার এলাকার সমস্ত বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, বজবজ ট্যাঙ্ক রোড অবরোধ করে এবং কাউন্সিলারের বাড়ি যায়। কাউন্সিলার শ্রীমতী রাণীবালা মণ্ডল তাঁর অসহায় অবস্থা বুঝিয়ে বলেন। বাসিন্দারা বলে, আমাদের সাথে মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দুলাল দাসের বাড়িতে যেতে হবে। শ্রীমতী মণ্ডল তাতে রাজি হন। এদিকে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন থেকে রাস্তা অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ এলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এবং চেয়াররম্যানের বাড়ি যাওয়া হয়। সেখানে এক ব্যক্তি কিছু অশালীন কথা বলায় সবাই বিরক্ত হয় এবং চেয়ারম্যানের দেহরক্ষী তাকে জোর করে বের করে দেয়। শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান সব শুনে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু অন্যায়ভাবে এক এলাকা জলমুক্ত করতে অন্য অন্য এলাকা ডুবিয়ে দেওয়ার প্রতিকারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান।

উল্লেখ্য, মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী দুলাল দাস মহাশয় হলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র শ্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরমশাই।

পড়াশুনার সাথে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উজ্জ্বল কলকাতার এক মফস্বলী স্কুলের কথা

যতীন বাগচী, কলকাতা, ৯ সেপ্টেম্বর •

কলকাতা পুরসভার ১৩১নং ওয়ার্ডের শান্তিপল্লি এলাকার অন্তর্গত 'শান্তি সংঘ শিক্ষামন্দির গার্লস্ হাইস্কুল' — এতদঞ্চলের সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম। এই বিদ্যালয়ে পড়তে আসা অধিকাংশই দারিদ্রসীমার নিচের তালিকার অন্তর্ভুক্ত পরিবারের মেয়ে। স্কুল পড়ুয়াদের পরিবারের বেশিরভাগ বাবা-মা লেখাপড়া জানে না, অর্থাৎ পড়ুয়াদের অধিকাংশই প্রথম স্কুল-শিক্ষিত প্রজন্ম। তা সত্ত্বেও বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার একশো শতাংশ। এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শুধু লেখাপড়াই নয়, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান ও পরিবেশনা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা থেকে ছাত্রীরা পুরস্কারও নিয়ে আসে।

এই বিদ্যালয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য 'শিশু সংসদ'। সংসদের সদস্য-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচি পালন করে। যেমন, বিদ্যালয় ভবন পরিষ্কার রাখা, বাথরুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, খাবার জল নষ্ট না করা। আবার খাবার আগে-পরে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া, মিড-ডে মিলের খাবার-দাবার পরিষ্কারভাবে তৈরি করা, ঢাকা দিয়ে রাখা, সব ছাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নজর দেওয়ার দায়িত্বও শিশু সংসদের। বিদ্যালয়ের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করার কাজও অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণভাবে পালন করে শিশু সংসদ। উল্লেখ্য, এই বিদ্যালয়ের বাথরুম এবং পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে CLPOA এবং GOAL নামে দুটি অসরকারি সংস্থা।

'ওয়ান থাউসেন্ড হকি লিগ'-এর পরিচালনায় আন্তঃবিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতায় এই বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ২০১১ শিক্ষাবর্ষে কলকাতা পুরসভা ও ডিআই অফিসের যৌথ প্রয়াসে 'যুব সংসদ পরিচালনা' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের মধ্যে এই বিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করে। এই 'মক পার্লামেন্ট' প্রতিযোগিতায় এই বিদ্যালয় থেকেই শ্রেষ্ঠ স্পিকার, শ্রেষ্ঠ বিধায়ক ও শ্রেষ্ঠ বিরোধী দলনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে ছাত্রীরা।

সাধারণভাবে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে আসা ছাত্রীরা পড়ার সাথে সাথে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চায় নিয়মিত নজির রেখে চলেছে। বিদ্যালয়ের এই সার্বিক সাফল্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি, জানিয়েছেন বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষিকা।

কোচবিহারে মঞ্চস্থ শাহ আব্দুল করিমের জীবন নিয়ে নাটক 'মহাজনের নাও'

রামজীবন ভৌমিক, কোচবিহার, ২৮ আগস্ট •

২৩ থেকে ২৬ আগস্ট অনীক আয়োজিত গঙ্গা যমুনা নাট্যোৎসব ২০১৩ অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে। সংগঠক আইপিএ ও অগ্নি নাট্যসংস্থা, কোচবিহার। শেষদিন ছিল বাংলাদেশের সুবচন নাট্যসংস্থার নাটক 'মহাজনের নাও'। নাট্যকার শাকুর মজিদ, পরিচালক সুদীপ চক্রবর্তী।

নাটকে বাউলসম্রাট শাহ আব্দুল করিমের জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিককে চিত্রিত করা হয়েছে। নাটকের শুরুর দিকে দেখা যায়, আব্দুলকে গ্রাম-পরিবার ছেড়ে যেতে বাধ্য করে মুসল্লীদের অত্যাচার। মুসল্লীরা মসজিদে নামাজের পর করিমের বে-শরিয়তি কাজ কারবার বন্ধ করবার ফরমান জারি করে। করিম সারিন্দাকেই জীবনের শুরু আর শেষ জ্ঞান করে গ্রাম ছাড়ে। নাটকের একেবারে শেষ দৃশ্যে আব্দুল করিম মারা যান। প্রচুর জনসমাগম হয়। ওই একই মসজিদের মুসল্লীরা জানাজার ব্যবস্থা করে। একবারে বসবার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় দু-বার জানাজা পড়া হয়। এই মসজিদেই আব্দুলের স্ত্রী সরলার মৃত্যুর পর আব্দুলের কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও, এই মুসল্লীরাই জানাজা পড়তে অস্বীকার করেছিল।

নাটকে উঠে এল, করিমের গান বাংলাদেশের বিবাহ প্রেম বিরহ থেকে সব আনন্দ উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনসেবা থেকে সরকারি অনুষ্ঠান, সবেতেই করিমের গান। বঙ্গবন্ধু থেকে মৌলানা ভাসানী – সকলের উপস্থিতিতেই সকলকে ছাপিয়ে আব্দুল করিম জনগণের হৃদয়ের মানুষ। নাটকে আমরা করিমকে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশায় কাঁদতে দেখি, প্রতিবাদ করতে দেখি গানের কলি দিয়েই। রাজনৈতিক নেতাদের রোষ আর প্রলোভনকে সহজেই পাশ কাটিয়ে, মানুষের ওপরে অত্যাচারের আর শোষণের বিচার চাইতে দেখি। হিন্দু মুসলমান হানাহানিতে ব্যথিত করিম গান — 'গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান/ মিলিয়া বাওলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম'।

মাত্র ১ ঘন্টা ৪০ মিনিটে প্রায় ৮৫ বছরের যাপিত জীবনকাহিনী। সুরেলা কণ্ঠের কমবয়সী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মঞ্চ ভাগ করে নেয় নিখুঁত বোঝাপড়ায়। মঞ্চসজ্জা অসামান্য। ৪ থেকে ৫টি ছোটো ছোটো বাক্স, একটি ময়ূরের মুখোশ, বাঁশের খাঁচায় ব্যাটারি চালিত হ্যাজাক, কয়েকটি কাঠের শক্তপোক্ত বৈঠা আর দুটো সাদা কাপড় দিয়ে পুরো মঞ্চের সাজ। সাথে সামান্য লাইট। সাদা পর্দার ওপর গোলাপী আলোর আভা আর পর্দার মাঝখানে বৃত্তাকার দেড় ফুট ফাঁকা জায়গার মধ্যে সরলা-করিমের আলিঙ্গন দৃশ্যকে অনেকদিন ভুলতে পারবে না কোচবিহারের দর্শক।

অনুষ্ঠানে আইপিএ-এর বাইপ্রোডাক্ট এবং অগ্নি নাট্য সংস্থার অমানিশা (নাট্যকার ও পরিচালক যথাক্রমে পূর্বাচল দাশগুপ্ত ও অর্ণব মুখোপাধ্যায়) এবং অনীক-এর দুটি নাটক, অ্যাডভেঞ্চার এবং তপতী (পরিচালক মলয় বিশ্বাস) অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর বাসরাস্তা বেহাল

শমিত আচার্য, নাজিরপুর, ৮ সেপ্টেম্বর •

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর যাওয়ার প্রধান সড়কপথটি ভেঙেচুরে বেহাল। হাজার হাজার মানুষের প্রতিদিনের চলাচলের একমাত্র সড়ক পথটির এই বেহাল অবস্থার কারণে প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা। তেহট্ট, বড়ো আন্দুলিয়া, বেতাই, নাজিরপুর, করিমপুর পর্যন্ত সমগ্র রাস্তাটিতেই গর্ত বা রাস্তার ওপরের চাকলা উঠে গেছে। এই সড়কপথে বাসগুলিতে যেতে যাত্রীদের নাকাল হতে হচ্ছে। খানা-খন্দ পাশ কাটাতে গিয়ে সাইকেল আরোহীরাও দুর্ঘটনায় পড়ছে। এত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির বেহাল অবস্থা সত্ত্বেও প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই।

'নাগরিক নাট্যদল' সত্যকে বলতে ভয় পায় না

২২ আগস্ট, শাকিল মহিনউদ্দিন, মেটিয়াব্রুজ •

অযথা নাটকের ভান না করে প্রকৃত নাটকের মধ্য দিয়ে জীবনদর্শনকে তুলে ধরুন। অভিনয় পথেঘাটে হতে পারে, মঞ্চেও হতে পারে। জীবনসত্যকে এমনভাবে পরিবেশন করুন যাতে সময়ের স্রোতে, জটিল জীবনের আবর্তে, চাওয়া-পাওয়ার অসম্ভব তাড়নায় বিস্মৃত হওয়া সত্য মানুষের ঢেকে যাওয়া চোখের পর্দা খুলে দেয়। নাড়া দেয় তার বন্ধক দেওয়া বিবেককে। খুঁজে পাক সে তার কষ্টার্জিত জীবনের অর্থ। আপনি শুধু এগিয়ে আসুন, অভিনয় কৌশল শেখানোর দায়িত্ব 'নাগরিক নাট্যদল'-এর। তারা সত্যকে বলতে ভয় পায় না। লেখাপড়া, খেলাধূলা, সংসার, চাকরি-বাকরি চলুক না, তার সঙ্গে সপ্তাহে একদিন চলুক অভিনয় শেখার কৌশল। তাগিদ আপনার ব্যক্তিগত। আহ্বান কানখুলি ঘোষপাড়ার পারিবারিক সাংস্কৃতিক সংগঠন 'নাগরিক নাট্যদল'-এর।

নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া বলা, সর্বোপরি অভিনয় শিখিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়াই তাদের লক্ষ্য। সংগঠনের প্রবীণ নাট্যকর্মী ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অজিত দাস বেশ ভণিতা করেই বললেন, 'সত্যি কথা বলতে ভয়/ সত্যি বলা বড়োই দায়। বিগত ১৯৯২-এ সাক্ষরতার নাটক অভিনয় দিয়ে এই সংস্থার পথচলা শুরু হয়েছিল। প্রথিতযশা নাট্যানুরাগীদের নিয়ে সংস্থার কর্মযজ্ঞ আজও অব্যাহত। প্রতি রবিবার দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নাট্যকর্মশালা চলে। যে কোনোদিন যোগাযোগ করা যেতে পারে, ঠিকানা, কানখুলি পূর্বপাড়া হরিসভা, কলকাতা ৬৬, দূরভাষ ৯১৪৩৬১৫৬৫৩। ১৪২০ বঙ্গাব্দের নতুন প্রযোজনা 'মহারাণি'। আসর ও মঞ্চে আমন্ত্রিত শো ও কল শো-র জন্য যোগাযোগ করুন 'পূর্বপাড়া যুবক সংঘ'-এর ক্লাবঘরে। মহারাণির শ্লোগান — ধর্মপথে কর্ম বাড়ান/মানুষমারা রাজনীতি দেশ থেকে দূর হটান।'

কোচবিহার মহিলা আবাসে থিয়েটার ওয়ার্কশপ

রামজীবন, কোচবিহার, ১৫ সেপ্টেম্বর •

কোচবিহার শহিদ বন্দনা স্মৃতি মহিলা আবাসে থিয়েটার ইন এডুকেশন ওয়ার্কশপ (২৮ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর) হয়ে গেল। পরিচালনায় কোচবিহার কম্পাস নাট্যগোষ্ঠী, সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছিল দশ থেকে ষোলো বছরের আশ্রিত মেয়েরা। শেষ দিনে ছাত্রীরা তাদের অর্জিত দক্ষতার প্রকাশ ঘটালো মহিলা আবাসের হলঘরে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়। মেয়েদের সমবেত স্বরক্ষেপ, শরীর সঞ্চালন, ও শেষে সুকুমার রায়ের নাটক 'উকিলের বুদ্ধি' অনুষ্ঠিত হল।

নাটকে অংশগ্রহণকারী মেয়েরা এবং দর্শক মেয়েরা প্রত্যেকেই সমাজে দুস্থ ও অসহায় পরিবার থেকে আসা। প্রত্যেকের জীবনেই আছে দুঃসহ যন্ত্রণার করুণ কাহিনী। যেমন এদেরই একজন বছর বারোর শাহজাদি। বাংলাদেশের একটি ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে। কাজের খোঁজে আসতে গিয়ে বর্ডারে বিএসএফ-এর হাতে মা ও ছোটো ভাই সহ ধরা পড়ে। এখন শাহজাদি ঠাঁই পেয়েছে শহীদ বন্দনা স্মৃতি মহিলা আবাসে, আর ওর মা ভাই কোচবিহারের জেলে। শাহজাদিকেও দেখা গেল আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের ছোট্ট অভিনয় সাবলীলভাবে করে যেতে।

কম্পাস নাট্যসংস্থার সদস্যরা অসীম ধৈর্য, অক্লান্ত পরিশ্রম আর অকৃত্রিম অপত্য স্নেহ দিয়ে আবাসিক মেয়েদের এলোমেলো আবেগ ও শুষ্ক জীবনে পনেরো দিনের সতেজতা ঢেলে দেয়। ফলশ্রুতিতে সুনিপুণ সজীব নাটক উপহার পেল আশ্রিত মেয়েরা। নিশ্চয় আগামী জীবনে পথ চলতে এই উপহার ওদের কিছুটা ভরসা আর স্বস্তি জোগাবে।

শিলিগুড়িতে শ্রমজীবীদের বসবাসের ওয়ার্ডগুলি ডেঙ্গুর প্রকোপে

প্রদীপন, শিলিগুড়ি, ১৪ আগস্ট •

শিলিগুড়ি শহরে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে, এখনও পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে দু-জন মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। একজন যুবক, নাম সাদ্দাম হুসেন (২০), অপরজন একটি বাচ্চা মেয়ে, নাম রেশমি (১০)। ডেঙ্গু সংক্রমণ বেশি হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরসভার সংযুক্ত ওয়ার্ডগুলোতে, যেমন ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডগুলিতে আছে লিম্বু বস্তি, যেখানে মূলত নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষের বাস; আশরফ নগর, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায় বেশি; রাজিব নগর, যেখানে নেপালি, বিহারি মুসলিম এবং বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বস্তি রয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে মশানাশক স্প্রে করা হয়েছে, কিন্তু যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেই বাসিন্দাদের অভিযোগ। বিশেষত মশার উৎস দূর করার জন্য বিশেষ উদ্যোগের অভাব রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও ডেঙ্গু চিহ্নিতকরণের জন্য ক্যাম্প করা শুরু করেছে। ৮ সেপ্টেম্বর রাজিব নগরে ক্যাম্প করেছে শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সেই ক্যাম্পে ডাক্তারবাবুরা রক্তপরীক্ষা করেছেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ক্যাম্প হওয়ার কথা মাটিগাড়ায়, যা শিলিগুড়ি শহরের এক প্রান্তে।

ডেঙ্গু প্রত্যেক বছরই হয়। কিন্তু এবারেই প্রথম ডেঙ্গুতে মানুষ মারা যাওয়ার খবর মিলেছে। ২০০২ সালে অজানা জ্বরে শিলিগুড়িতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল।

নদিয়ার নতিডাঙা মোড় থেকে বোহালমারির রাস্তা কয়েক দশক ধরেই অগম্য

বেহাল রাস্তার ছবি তুলেছেন প্রতিবেদক, ৮ সেপ্টেম্বর।

শ্রীমান চক্রবর্তী, নতিডাঙা, ৮ সেপ্টেম্বর •

নদিয়া জেলার মুর্শিদাবাদ সীমান্ত এলাকা এবং একইসাথে বাংলাদেশ সীমান্তের থেকে ২০-২৫ কিমি দূরের এলাকা নাজিরপুর। এখানকার থানারপাড়া অঞ্চলের অন্তর্গত নতিডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হসপিটাল মোড় থেকে পাড়দিয়াড় বোহালমারি পর্যন্ত ২ কিমি রাস্তার অবস্থা গত প্রায় তিন দশক থেকেই বেহাল। রাস্তাটি এই অঞ্চল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার সাথে সড়কপথে সংযোগ রাখার একমাত্র পথ। গত দু-বার ধরে এই গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস দলটির দখলে। তার আগে এটা ছিল সিপিএম-এর দখলে। সে সময় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও, গত দেড় দশকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, কয়েক বছর আগে রাস্তার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ইট ফেলার জন্য এলেও, তা আর রাস্তায় পড়েনি। তা গেছে প্রধানের কাছে। আর নরম কিছু ইটের টুকরো ফেলা হয়েছে রাস্তায়, যা কোনো কাজেই দেয়নি। বর্তমানে এই অঞ্চলের বিধায়ক শ্রী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ (বামফ্রন্ট) এবং সাংসদ শ্রী মান্নান হোসেন (কংগ্রেস) -এর কাছে দরবার করেও কিছু সুরাহা মেলেনি। এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সাইকেল, ভ্যান, পায়ে হাঁটা বা ছোটো মোটরগাড়ি — কোনো কিছু নিয়েই এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা যায় না। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, প্রত্যেকবার ভোটের আগে নেতারা আসেন প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি নিয়ে, আর রাস্তা সারাইয়ের কথা বলে যান। অথচ ভোট ফুরোলেই সবকিছু শেষ। তখন নেতারা টাকার ভাগ নিতে আসেন রাতের অন্ধকারে।

সমগ্র রাস্তাটিতে পদে পদে এক থেকে দেড় ফুটের গর্ত এবং সেগুলি লম্বা বা চওড়ায় ৫-৬ ফুট থেকে ১০-১২ ফুটও আছে। আমি নিজে এই সম্পূর্ণ রাস্তাটি বাইকের পিছনে বসে যেতে গিয়ে দেখেছি, প্রায় প্রাণ হাতে নিয়েই চলতে হয়। বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের অনেকেই এই পথ দিয়েই স্কুলে যাতায়াত করছে প্রাণ হাতে নিয়ে। এলাকার বিভিন্ন স্কুলের মাস্টারমশাইরা সম্প্রতি বেশ কয়েকবার পঞ্চায়েত, বিডিও, এসডিও-র কাছে আবেদন জানিয়েছে, কোনো লাভ হয়নি। নবগঠিত জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পুজোর আগে রাস্তাটি সরেজমিনে দেখতে আসার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর যাওয়ার প্রধান সড়কপথটিও (এই রাস্তাতেই নাজিরপুর) ভেঙেচুরে বেহাল। হাজার হাজার মানুষের প্রতিদিনের চলাচলের একমাত্র সড়ক পথটির এই বেহাল অবস্থার কারণে প্রায়শই ঘটছে দুর্ঘটনা। তেহট্ট, বড়ো আন্দুলিয়া, বেতাই, নাজিরপুর, করিমপুর পর্যন্ত সমগ্র রাস্তাটিতেই গর্ত বা রাস্তার ওপরের চাকলা উঠে গেছে। এই সড়কপথে বাসগুলিতে যেতে যাত্রীদের নাকাল হতে হচ্ছে। সাইকেল আরোহীরাও দুর্ঘটনায় পড়ছে খানা-খন্দ পাশ কাটাতে। এত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির বেহাল অবস্থা সত্ত্বেও প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই।

চারের পাতার পর আলাদা থাকা ভালো

অপর একটি বিতর্কের বিষয় ছিল, 'ক্ষুদ্র রাজ্য জনকল্যাণ সাধন করে না', যা কিনা এই সময় যথেষ্ট তাৎপর্যময় ও প্রাসঙ্গিক। সেইমতোই বিতর্কে উঠে আসে তেলেঙ্গানা, গোর্খাল্যান্ড, ছত্তিশগড় রাজ্য সমূহের কথা। পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা বলা হয়। রাজ্য চাইলেই রাজ্য হওয়া যায় না, তার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা। আবার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিপক্ষে অংশগ্রহণকারী এক ছাত্র বলে, বড়ো রাজ্যে সমস্যা হচ্ছে বলেই ছোটো রাজ্যের দাবি আজ হচ্ছে, যার উত্তর আর পক্ষে থাকা ছাত্রটির পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিপক্ষের একটি ছাত্র বলে, 'একসাথে জন্তুর মতো থাকার চেয়ে আলাদা মানুষের মতো থাকা ভালো'। যদিও এই মন্তব্যে পক্ষে থাকা প্রায় প্রত্যেকেই বলে আমরা ভারতবাসী, এক জাতি, এক দেশ, যদিও তারা আদিবাসীদের প্রতি বঞ্চনা অস্বীকার করতে পারেনি। আরও তর্ক বিতর্কের মধ্যে দিয়েও উঠে এল, রাজ্যের আয়তনের ওপর তার সমৃদ্ধি নির্ভর করে না, কারণ ছোটো রাজ্য হিসেবে যেমন সিকিম সফল, তেমনি বড়ো রাজ্য হিসেবে তামিলনাড়ু সফল। শেষপর্যন্ত শিক্ষকদের বক্তব্য ছিল, যে ভারতবর্ষ নিয়ে আমরা গর্ব করছি, তা ব্রিটিশদের বন্দুকের জোরে অধিকৃত ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র। তাই সেক্ষেত্রে আমরা যদি বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসের ও বিভিন্ন জনজাতির উন্নয়নের কথা ভেবে ছোটো রাজ্য করি তাতে ক্ষতি কী? আমরা এমন রাষ্ট্র চাই, যেখানে মানুষ সুস্থভাবে বসবাস করবে। নাকি এমন রাষ্ট্র চাই, যেটা একটা ম্যাপ, যেখানে শুধু দ্রাঘিমা আর অক্ষাংশের ডিগ্রি থাকবে, কিন্তু মানুষ সুখে থাকবে না?

Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

ময়দা কালীবাড়ি, বহরু

দীপঙ্কর সরকার, হালতু, ৩১ আগস্ট •

কলকাতা থেকে ৫০ কিমি দূরত্বে, শিয়ালদহ থেকে লক্ষীকান্তপুর লোকালে বহরু স্টেশনেতে নেমে বাঁদিকে (পূর্বদিকে) উত্তরপাড়া হয়ে ৩ কিমি গেলেই ময়দা গ্রাম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার তারদহ ও মেদিনীপুরের গেঁওমালির একসময় পর্তুগীজদের জমিদারী ছিল। তারদহ থেকে তার এক অংশ ময়দা অঞ্চলে চলে আসে। সেই সময় এই অঞ্চল দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। পরে তা অন্যত্র সরে যায়। ময়দায় এসে পর্তুগীজরা বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত করে। পর্তুগীজ মাদিয়া শব্দ থেকে ময়দা নামের উৎপত্তি। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত-এ আছে বহরুর নিকটবর্তী আদি গঙ্গার পূর্ব তীরবর্তী ময়দা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। কারণ ইহা একটি রেভেনিউ পরগনার কেন্দ্রীয় দফতর ছিল এবং পর্তুগীজদের একটি বন্দর ছিল। কবি কৃষ্ণরাম দাশের গ্রন্থাবলীর রায়মঙ্গল কাব্যের ১৮৬ পৃষ্ঠায় ময়দা গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ময়দা গ্রামের পূর্বদিকে উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর প্রসারিত একদা একটি রাস্তা ছিল দ্বারির জাঙ্গাল। রাস্তাটি বর্তমানে লুপ্ত। আদি গঙ্গাতীর বরাবর কালীঘাট থেকে ছত্রভোগ পর্যন্ত এই পথ ছিল। এই ময়দা গ্রামে পর্তুগীজদের কীর্তির কোনো নিদর্শন না পাওয়া গেলেও শ্রী শ্রী দক্ষিণাকালী মাতার পাতালভেদি মন্দিরের জন্য এই গ্রাম বিখ্যাত।

এই গ্রামের অতিপ্রাচীন মন্দির হল এই পাতালভেদী শ্রী শ্রী দক্ষিণাকালীবাড়ি। ৭৩ শতক জায়গা জুড়ে এই মন্দির চত্বর। পশ্চিমে মায়ের পুকুর ১ বিঘা জমি নিয়ে। মায়ের মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণে শিবমন্দির। ডাইনে ভোগ ঘর। পেছনে পশ্চিমে উত্তরে সাধক ভবানী পাঠকের পঞ্চমুণ্ডির আসন। ময়দা গ্রামের এই পাতালভেদী শ্রী শ্রী দক্ষিণাকালী মায়ের সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত।

কালীপুজোর সময় রাজা পার্বণ রায়চৌধুরীদের নামে সংকল্প করে একই সঙ্গে জোড়া পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। ভাদ্রমাসে তাল নবমীতে উৎসব শুরু। কালীপুজোর পর মায়ের বাৎসরিক মহা অন্নভোগ হয়। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ১২টার পর থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত নিঃসন্তান জননী ও রোগীদের মায়ের কবচ দেওয়া হয়। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মায়ের মন্দিরের চত্বর থেকে উত্তরে চৌধুরী পাড়া থেকে দক্ষিণে ঘোষপাড়া অবধি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিরাট মেলা বসে।

ময়দা কালীবাড়ির উন্নয়ন সমিতি কর্তৃক নাটমন্দির ১৩৯০

ময়দা কালীবাড়ির ছবি তুলেছেন প্রতিবেদক।

সালে তৈরি হয়। এই উন্নয়ন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী সুনীল সরকার ও সভাপতি শ্যাম প্রসাদ ব্যানার্জি (৯৪৩২৮৯৭১৬২)।

মন্দির চত্বরের আনাচে কানাচে পুরো ঘুরে দেখে কয়েকটি ছবি তুললাম। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারেরও ছবি নিতে নিতে মনে হল, তেমন কোনো বিশেষ স্থাপত্যশৈলী নেই। তবে মন্দিরটিকে নিয়ে বিশ্বাসী ভক্তজনের মধ্যে যথেষ্ট আস্থা আছে। বহু দূরদূরান্ত থেকে ভক্তজনেরা আসে তাদের নিজ নিজ মনোবাসনা নিয়ে। আমি এসেছিলাম ঘরের কাছে মন্দিরময় একটি গ্রামের ইতিবৃত্ত জানতে। আমার ভবঘুরে মনে নতুন কিছু দেখার একরাশ অনুভূতি নিয়ে ফিরে এলাম ট্রেনে করে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল।

সিনেমা পর্যালোচনা

তাসের দেশ

সোহিনী রায়, কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর •

আমরা যখন প্রিয়া সিনেমা হলে পৌঁছোলাম, তখন বাজে চারটে তিপ্পান্ন। ঢুকে দেখলাম, সিনেমা শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজপুত্র আর সওদাগর পুত্র জলে চান করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পত্রলেখার আগমন হল। শুরু হল, 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে'। বুঝলাম, সিনেমাটার বিশেষ কিছু আমরা বাদ দিইনি। সিনেমা শেষ হল ছ-টা পঁচিশ নাগাদ। গোটা সময়টা একটা সম্পূর্ণ অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল।

পাশাপাশি দুটো গল্প চলতে থাকে সিনেমা জুড়ে। গল্প দুটো খানিকটা সমান্তরাল হয়েও পুরোটা নয়। শেষে গিয়ে দুটো গল্প একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যে মিশে যায়। একটি গল্প তাসের দেশ সিনেমায় যে 'তাসের দেশ' সিনেমাটির নির্দেশক (জয়রাজ), তাকে ঘিরে। অন্যটি রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ নৃত্যনাট্য নিয়ে, যেটি জয়রাজ কল্পনা করেছেন। একটি আমাদের ওপর চেপে বসা পুরোনো, পচনশীল সাংস্কৃতিক অনুশাসনের গল্প, অন্যটি রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের গল্প। একটিতে জয়রাজ যে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, সেটি দেখানো হচ্ছে। অন্যটিতে তাসের দেশ হিসেবে দেখানো হচ্ছে রাষ্ট্রের মিলিটারি, যুদ্ধাস্ত্র, কড়া নিয়মের বন্ধন ইত্যাদিকে।

'তাসের দেশ'-এর অংশটিতে রবীন্দ্রনাথের মূল সংলাপ হুবহু ব্যবহার করা হয়েছে। তাসের দেশের চিত্রায়ণ আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের সংলাপ খুবই মানানসই, বিশেষ করে তাসেদের মুখে। একেকটি তাসের উচ্চারণ ভঙ্গী একেকরকম। সবাই বাংলা বললেও, পুরোপুরি বাংলা টানে কথা বলে না। তবে কিছু সংলাপ, মূলত রাজপুত্র আর সওদাগর পুত্রের মুখে, গোটা দৃশ্যের মধ্যে দেখতে খানিক বেমানান। দুজনেই খালি গায়ে সবুজ আর কমলা রঙের বারমুডা পরে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলছে, এটা দেখতে বেশ অসুবিধা হয়। যে দর্শক এই ধরনের দৃশ্যে 'দিল চাহতা হ্যায়' জাতীয় গান ও সংলাপ শুনে অভ্যস্ত, তাদেরকে চিত্রপরিচালক সম্ভবত এই অসুবিধাতেই ফেলতে চেয়েছেন।

তাসেদের পোশাক, পরিচ্ছদ, ব্যবহার, চলাফেরা, থাকার জায়গা (তাঁবু) অত্যন্ত উপভোগ্য। বিশেষ করে যখন রাজপুত্র-সওদাগর পুত্রকে ঘিরে ধরে, রাইফেল বাগিয়ে একের পর এক প্রশ্নবাণে চেপে ধরছে, তখন মনে হয় সত্যি দমটা বন্ধ হয়ে আসছে। তাসের দেশ-এ একটি গে ও একটি লেসবিয়ান সম্পর্কের উত্থাপন পরিচালকের নিজস্ব অবদান। মনে হয়, কোনো একটা বক্তব্যে উপনীত হতে চাইছেন বলে এই সমকামী সম্পর্কের আমদানি জরুরি ছিল। পত্রলেখার চরিত্রটিকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে অন্যরকম ভাবে দেখানো হয়েছে — সেটা ভালোই লাগে। কিন্তু পত্রলেখার চরিত্রটিকে এত বিচিত্রভাবে, মানে তার মুখশ্রী, পোশাক-আশাক, কানে সেফটিপিন ইত্যাদি নিয়ে, এক কথায় যত উদ্ভটভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, এতটা না করলেও চলত। সিনেমাটির কিছু কিছু দৃশ্য প্রায় বিজ্ঞাপনের মতো, মোটেই ভালো লাগে না।

ছবিটার একটি জোরালো দিক হল গান। গোটা ছবি জুড়ে গানের ব্যবহার অসাধারণ। তাসের দেশের বহুশ্রুত সবকটি গানকে দৃশ্যপটের সাথে মিশিয়ে প্রায় একটি অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে ছবিটি। এক্ষেত্রে 'এলেম নতুন দেশে', তাসের দেশের জাতীয় সঙ্গীত — বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। শেষ গান, মানে, 'বাঁধ ভেঙে দাও'-ও ভারি ভালো লাগে। বিশেষ করে যখন 'ইচ্ছে ইচ্ছে ইচ্ছে' গানটির সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়। বাঁধ ভেঙে দাও শেষ হওয়ার সাথে সাথে বড়োই দুম করে শেষ হয়ে যায় সিনেমাটি। একটি পরিপূর্ণ সিনেমার চেহারা নেয় না যেন, মনে হয় কোনো রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রচারমূলক ছবি।

অন্য যে গল্পটি চলতে থাকে জয়রাজকে ঘিরে, সেটি একটি আদ্যন্ত তথাকথিত আর্ট ফিল্ম বলে পরিচিত সিনেমার মতো। ট্রেন, রেল লাইন, স্টেশন, আবছায়া, ভাঙা পুরনো জমিদার বাড়ি, আলো-আঁধারি, বিধবা মেয়ে, ঝোলা ব্যাগ, ছেঁড়া বই, রেল লাইন ধরে হেঁটে যাওয়া, বিষণ্ণ সন্ধ্যা ইত্যাদি সম্বলিত ঋত্বিক ঘটক মার্কা চিত্রায়ণ। জড়দ্গব, প্রাচীন সংস্কৃতি বলতে ভাঙা বাড়ি, বহুরূপী, আর সেই সংস্কৃতির অনুশাসনে শোষিত বলতে বাঙময়, ব্যথাতুর চোখওয়ালা সাদা শাড়ি শোভিত দুঃখী বিধবা, আর তাকে উদ্ধার করতে আসা ঝোলা ব্যাগ কাঁধে আঁতেল চিত্র পরিচালক ইত্যাদির চিত্রায়ণ ভারী ক্লিশে।

সিনেমাটিতে সাবটাইটেলের ব্যবহার অভিনব এবং চমৎকার। দুটো গল্পই শেষ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন, সাংস্কৃতিক অনুশাসন থেকে উত্তীর্ণ, যৌনভাবে স্বাধীন একটি জগতের দিশায়।

‘একসাথে জন্তুর মতো থাকার চেয়ে আলাদা মানুষের মতো থাকা ভালো’

দেবব্রত মণ্ডল, পূর্ব যাদবপুর, ৫ সেপ্টেম্বর •

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ১২৫তম জন্মশতবার্ষিকী এবার। অজয়নগরের এক অনামী 'লার্নিং কোচিং সেন্টার' প্রতি বছরের মতো এবছরও পালন করল শিক্ষক দিবস। অনুষ্ঠানে মূলত কবিতা, গান, ছড়া, আর মূল আকর্ষণ হিসেবে দুটি বিতর্ক আলোচনা আয়োজিত হয়েছিল। ছোটো ছাত্র আবৃত্তি করেছিল, 'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে'। শিক্ষক আবৃত্তি করেছিলেন সুবোধ সরকারের 'শাড়ি' কবিতাটি।

ছোটো ছাত্রছাত্রীদের বিতর্কের বিষয় ছিল 'দূরদর্শন আমাদের নানাভাবে শিক্ষা দেয়'। এই বিষয়ে দুটি পক্ষে জনা পনেরো করে ছাত্রছাত্রী ছিল। তারা সুকৌশলে তাদের যুক্তির মাধ্যমে বিতর্কের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। পক্ষে, একজনের যুক্তি ছিল যে, শিক্ষামূলক সমস্ত তথ্যই আমরা টিভি থেকে পেতে পারি, ডিসকভারি চ্যানেল, নিক নামক চ্যানেল, যেখান থেকে হাতে কলমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। অপরদিকে বিপক্ষের যুক্তি ছিল, অনুষ্ঠানের মাঝেই প্রচারিত হওয়া অসংলগ্ন বিজ্ঞাপন নিয়ে। এছাড়াও অতিরিক্ত টিভি দেখার ফলে চোখের ও মানসিক চাপের কথাও বিতর্কের মাধ্যমে উঠে এসেছিল। শেষপর্যন্ত এক শিক্ষকের মন্তব্য, 'সারসের মতো দুধটা খেয়ে চিনিটা রেখে দিতে হবে'।

এরপর তিনের পাতায়

খ ব রে দু নি য়া

ওয়ারশ-তে শুরু হয়েছে ব্যাপক শ্রমিকের বিক্ষোভ

প্রধানমন্ত্রীর মূর্তি ঘিরে শ্রমিক বিক্ষোভ ওয়ারশ-তে, ১৪ সেপ্টেম্বর, ডিপিএ।

কুশল বসু, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর, সূত্র 'দি হিন্দু' পত্রিকা •

পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ-তে গত বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) থেকে শ্রমিকদের ধরনা চলছে। দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবীরা এসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে পোলান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক পরিচালিত সরকারের বাজারমুখী নয়া অর্থনীতির বিরুদ্ধে। এই নয়ানীতির ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে — শ্রমিকদের দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অবসরের বয়স বাড়িয়ে মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬০ থেকে ৬৭ ও পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬০ থেকে ৬৫ বছর করা হয়েছে। অন্যদিকে পোল্যান্ডে শ্রমিকদের গড় মজুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি মাসে ১১৫০ ডলার, যা ইউরোপের যে কোনো দেশের তুলনায় কম। যেহেতু ওখানে বেকারের সংখ্যা মোটের ওপর ১৩% তাই তার সুযোগ নিয়ে কোম্পানিগুলো স্বল্প মেয়াদী চুক্তিতে শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করছে এবং যখন তখন ছাঁটাই করছে। ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারও ২০১১ তে ৪.৫% থেকে নেমে বর্তমানে ১.৯%-এ দাঁড়িয়েছে। সব মিলিয়ে দেশের যা হাল তাতে টাস্ক পরিচালিত পোল্যান্ডের সরকার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে কমিউনিজমের পতনের পর থেকে পোল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় থেকেছেন এই ডোনাল্ড টাস্ক (এই নিয়ে ছয় বছর)।

গত শনিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ওয়ারশ-র রাস্তায় ১ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তাদের হাতে প্ল্যাকার্ডে পোস্টার লেখা ছিল, 'টাস্ক সরকার দূর হটো'। কেউ লিখে এনেছিল, 'আমি টাস্কের ক্রীতদাস'। বিক্ষোভকারীরা, সরকারী নীতি না পাল্টালে, সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেবে বলে হুঁশিয়ারি জানিয়েছে। তারা বাঁশি বাজিয়ে, ভেঁপু বাজিয়ে, ধোঁয়ার বোমা ফাটিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে এবং বলেছে, 'আমরা এমন কোনো নীতি মানতে পারি না যা আমাদের দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেবে।' বিক্ষোভকারীদের নেতা জান গুজ্ জানিয়েছেন, 'দরকারে আমরা গোটা দেশে অবরোধ করব, সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেব।'

আফগানিস্তানে কয়লা খনিতে ধস, মৃত খনি শ্রমিকরা

কুশল বসু, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর •

আফগানিস্তানের সামানগান প্রদেশে রুই দিউ আব জেলায় একটি কয়লা খনির দেয়াল ধসে পড়ে ২৪ জন খনি শ্রমিক মারা গেছে। ২০০১ সাল থেকে মার্কিন আগ্রাসনের মধ্যে থাকা আফগানিস্তানের মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা খনিজ ভাণ্ডারের হদিশ পেয়েছিল আমেরিকা ২০০৬ সালে। যে পরিমাণ খনিজ সম্পদ রয়েছে সেখানে, তা এক ট্রিলিয়ন ডলারের মতো বলে জানিয়েছিল তারা। এই খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে লোহা এবং কয়লা। কিন্তু বিস্তীর্ণ সেই খনিজের বেশির ভাগটাই এখনও মাটির নিচে রয়ে গেছে। আফগানিস্তানের বেশিরভাগ জায়গাতেই তালিবান এবং মার্কিন ফৌজের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, খনন চালানো অসম্ভব। সামানগান প্রদেশে যুদ্ধ তেমন বিস্তৃত না হওয়ায় এখানে জোর কদমে খনন শুরু হয়েছিল।

খনির দেওয়াল ভেঙে পড়ার সাথে সাথে আশেপাশের গ্রাম থেকে কয়েকশ' মানুষ ছুটে যায় চাপা পড়া শ্রমিকদের বাঁচাতে। কিন্তু খনি থেকে নির্গত হওয়া মারণ গ্যাসে তাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আটকে পড়া ২৭ জনের মধ্যে ২৪ জনেরই মৃত্যু হয়।

এবার পাট হয়েছে ভালোই। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকা কালিরঘাটে পাট কেটে পচাতে দিচ্ছে চাষিরা। ছবি শ্রীমান চক্রবর্তী, ৮ সেপ্টেম্বর।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata 9. Published at B23/2 Rabindranagar, P.O. Bartala, Kolkata-18. Editor Shamik Sarkar